হাইকোর্টের চূড়ান্ত রায়

রাণী বিভাবতীর পরাজয়

ভাওয়ালের মেজকুমারের জয়

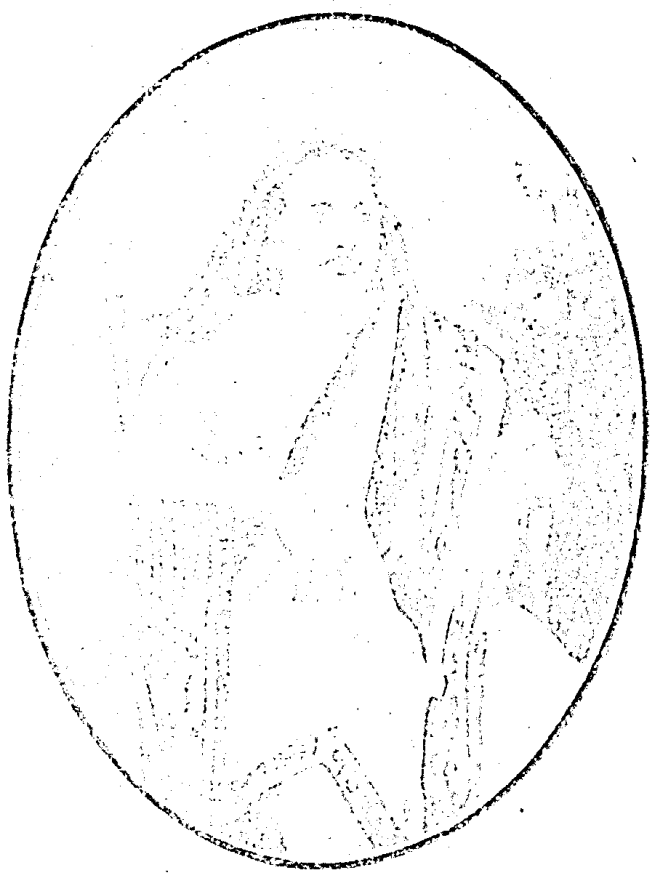

বাদী—মেজকুমার

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস সম্পাদিত

প্রাপ্তিস্থান—২৩৩নং মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা।

বিনিময়—অৰ্দ্ধ আনা

হাইকোর্টে ভাওয়াল মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি

মেজরাণী বিভাবতীর দাবী মায় খরচা ডিস্‌মিস্

পূজার পূর্ব্বে এই মামলার তিনজন বিচারপতির পৃথক পৃথক রায় পঠিত হইয়াছিল। বিচারপতি বিশ্বাস ও বিচারপতি কষ্টেলোর রায় বিভাবতীর দাবীর বিপক্ষে গিয়াছিল এবং বিচারপতি লজের রায় রাণীর স্বপক্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল কিন্তু অধিকাংশের মত অনুযায়ী রাণীর মোকদ্দমা নামঞ্জুর হইবার কারণ ঘটিয়াছিল। সেই সময় বিচারপতি বিশ্বাস বৈধতার প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, বিচারপতি কষ্টেলো যখন দীর্ঘ দিনের অবকাশে বিলাতে ছিলেন (এবং এখনও আছেন) তখন বিচারালয়ে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া রায় পাঠ না করিলে তাহা বৈধ হইতে পারে না কিন্তু রাণীর পক্ষের রায়দানকারী মিঃ লজ মিঃ কষ্টেলোর রায় বৈধ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন। এ প্রকার বৈধতার প্রশ্ন উপস্থিত হওয়াও সাব্যস্ত হইয়াছিল। পূজার অবকাশের পর হাইকোর্ট খুলিলে বৈধতার প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করা হইবে।

বর্ত্তমানে সেই বৈধতার প্রশ্নের সমাধান হইয়াছে—বিলাত হইতে মিঃ কষ্টেলো যে রায় পাঠাইয়াছিলেন এবং হাইকোর্টে বিচারপতি বিচার কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল, উহা বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

সুতরাং বিশ্ববিখ্যাত ভাওয়াল মামলার আপীলে হাইকোর্টের চূড়ান্ত রায় হইতেছে—

বাদী সন্ন্যাসীই ভাওয়ালের প্রকৃত মেজকুমার। ঢাকার আদালতের জজ মিঃ পান্নালাল বসু বাদী সন্ন্যাসীকে ভাওয়ালের মেজকুমার বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে ভাওয়াল জমিদারীর এক-তৃতীয়াংশ দিবার নিমিত্ত যে রায় দিয়াছিলেন তাহার বিরুদ্ধে মেজকুমারের পত্নী রাণী বিভাবতী হাইকোর্টে যে আপীল দায়ের করিয়াছিলেন তাহা অধিকাংশ বিচারপতির মত অনুযায়ী নামঞ্জুর হইল—এবং নির্দ্দিষ্ট হইল আপীলকারিণী বাদীকে মামলার খরচ দিবেন।

ভাওয়ালের মেজকুমারের জয়

আপীল মামলার রায় বেরুল মেজকুমারের জয়,
মুখ পুড়্‌লো বিভাবতীর ভীষণ পরাজয়।
নিজের পতি উড়িয়ে দেয় ভণ্ড নাগা ব'লে,
তেজ দম্ভ দেখায় কত বুক ফুলিয়ে চলে।
মানেনা স্বামী ভাইএর জন্য পড়্‌লো মাথা-ব্যথা,
হিন্দুনারীর এমন কীর্ত্তি কেউ শোনেনি এমন কথা।
দেশের লোক বল্‌ছে সাধু রাণীর স্বামী হয়,
ঢাকা কোর্টের রায় বেরুল, মিথ্যা তাহা নয়।
তবুও রাণী তেজ দেখিয়ে আপীল মামলা করে,
কি যাদুই করেছে দাদা, দাদার কথায় মরে।
ধন্য রাণী দাদা-ভক্ত গুণের অন্ত নাই,
আপীলেও আবার হার হয়ে যায় লজ্জা তবু নাই।
রাজার শালা সত্যেন বাবু—কীর্ত্তির নাহি শেষ,
রাণী ভগ্নির পিছনে থেকে যুদ্ধ চালান্ বেশ।
সকল অস্ত্র ব্যর্থ এখন মিথ্যা পড়ে ধরা,
পুড়িয়ে এলেন বাজে শব বলে' রাজার মড়া।
লুট চালিয়ে রাজার ভাণ্ডার স্ফূর্ত্তি কত প্রাণে,
খুনের দায়ে এখন বুঝি জান্‌টা ধরে টানে।

কোথায় আজ আশু ডাক্তার ! যার নিঃশ্বাসে বয় বিষ,
মরেছিল রাজার ছেলে বিষের জ্বালায় অহর্নিশ।
কোন্ লোভেতে পিশাচ তোমার পশুর অধম বৃত্তি,
পৃথিবীর সেরা ভাওয়াল মামলায় রইল বটে কীর্ত্তি !
সভ্য সমাজ শুনি আজকাল—সয়তান ভরা কত,
কত ডাক্তার, ডাক্তারণী পাপ চালাচ্ছে অবিরত।
পাকুড় মামলার হত্যাকাণ্ডের ডাক্তার আজও জেলে,
বিষয়লোভী পাপীও আছে সঙ্গে রাজার ছেলে।
ভাওয়াল মামলার পাপীদেরও শাস্তি কঠোর চাই,
তা নইলে দেশ সয়তানেতে ছেয়ে ফেল্‌বে ভাই !

মামলার ইতিহাস

১৯০৯ সালের ৮ই মে তারিখে দার্জ্জিলিংএ ভাওয়ালের মেজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় মারা যান বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হয়। সেই সময় এইরূপ একটা গুজব রটে যে, প্রকৃতপক্ষে কুমারের মৃত্যু হয় নাই। তাঁহার দেহ দার্জ্জিলিংএর শ্মশানক্ষেত্র হইতে দুর্য্যোগ রজনীতে অভাবনীয় রূপে একদল সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। তাহার প্রায় ১২ বৎসর পর বঙ্গাব্দ ১৩২৭ সনের মাঘ কি ফাল্‌গুন মাসে ঢাকার বাকল্যাণ্ড বাঁধে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়, ১৩২৭ সনের চৈত্র সংক্রান্তির দিন ঐ সন্ন্যাসী জয়দেবপুরে গমন করেন। ইংরাজী ১৯২১ সালের ৪ঠা মে তারিখে তিনি জয়দেবপুরে ভাওয়ালের মেজকুমার বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। কুমারের ভগ্নী শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, পিতামহী সত্যভামা দেবী এবং দশ

কোন কোন আত্মীয়স্বজন সন্ন্যাসীকে "মেজকুমার" বলিয়া স্বীকার করেন। ভাওয়ালের বহু প্রজা, কর্ম্মচারী এবং বাঙ্গলাদেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও তাঁহাকে মেজকুমার বলিয়া চিনিতে পারেন বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু বোর্ড অব রেভিনিউ ১৯২১ সালের ৪ঠা জুন তারিখে ঘোষণা করেন যে, —সন্ন্যাসী প্রতারক, ভাওয়ালের মেজকুমার নহেন। ঢাকার কালেক্টরও বোর্ডের অনুমতি অনুসারে ঐ মর্ম্মে ভাওয়ালের সর্ব্বত্র ঘোষণাপত্র প্রচার করেন।

বাদী সন্ন্যাসী উহার কয়েক বৎসর পরে ১৯৩০ সালের ২৪শে এপ্রিল নিজেকে কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ বলিয়া দাবী করিয়া ঢাকার দেওয়ানী আদালতে স্বত্বের মামলা দায়ের করেন। ১৯৩৩ সালের ২৭শে নবেম্বর ঢাকার সাবজজ শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসুর আদালতে এই মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। ১৯৩৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে বিবাদীপক্ষের শুনানী আরম্ভ হয় এবং ১৯৩৬ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিবাদীপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়। তখন বিচারকের বিশেষ অনুমতিক্রমে বাদীর গুরু ধর্ম্মদাস নাগার পরিচয় সম্পর্কে বাদীপক্ষে আরও কতিপয় ব্যক্তির সাক্ষ্য গৃহীত হয়। ১৯৩৬ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী হইতে বিবাদী-পক্ষের ব্যারিষ্টার মিঃ এ এন চৌধুরী সওয়াল আরম্ভ করিয়া ৩১শে মার্চ্চ উহা শেষ করেন এবং ঐ দিনই বাদীপক্ষের ব্যারিষ্টার মিঃ বি সি চ্যাটার্জ্জি সওয়াল আরম্ভ করেন। প্রায় আড়াই বৎসর কাল একটানাভাবে এই মামলার শুনানী চলে।

বাদীর প্রার্থনা

ভাওয়াল মামলার বাদী আদালতের নিকট নিম্নলিখিত প্রার্থনা করিয়াছিলেন :—

(১) বাদীকে ভাওয়ালের স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র বলিয়া ঘোষণা করা হউক।

(২) বিবাদী রাণী বিভাবতী দেবীর উপর এই মর্ম্মে একটি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করা হউক যে, ভাওয়ালের স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ এবং তাহা হইতে উৎপন্ন সম্পত্তির ভোগ দখলের ব্যাপারে তিনি যেন বাদীকে কোন প্রকারে বাধা প্রদান না করেন।

(৩) সমস্ত বিবাদীর উপর এই মর্ম্মে একটী অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করা হউক যে, এই মামলার শুনানী চলিবার সময়ে তাঁহারা যেন বাদীর ভোগদখলে কোন প্রকারে বিঘ্ন উৎপাদন না করেন।

(৪) যে অবস্থায় এবং যে কারণে মামলা আনয়ন করা হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া আইন অনুসারে বাদীর আর যদি কোন প্রকারে কোন কিছু সাহায্য প্রাপ্য হয়, তাহা প্রদান করা হউক।

(৫) মামলায় বাদীপক্ষের যে ব্যয় হইবে বিবাদীপক্ষ হইতে আদায় করিবার জন্য বাদীর অনুকূলে ডিক্রি দেওয়া হউক।

মামলার বিচার্য্য বিষয়

ভাওয়াল মামলার বিচার্য্য বিষয়সমূহের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) বাদীর মামলা দায়ের করিবার কোন কারণ ঘটিয়াছে কি না।

(২) এই মামলা তামাদি দোষে বারিত কি না।

(৩) দখলে নাই বলিয়া বাদী সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে কি না।

(৪) বাদী ভাওয়ালের মেজকুমার কি না।

(৫) বাদী ও ভাওয়ালের মেজকুমারের সাদৃশ্য আছে কি না।

(৬) প্রতিবাদীপক্ষের লিখিত জবানবন্দী অনুসারে সন্ন্যাস গ্রহণের ফলে বাদী ঐহিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে কি না; প্রতিবাদী পক্ষের অথবা লিখিত বিবৃতি অনুসারে সন্ন্যাস গ্রহণের কথা মানিয়া লইয়াও বাদীকে ঐহিক অধিকার সম্পর্কিত কোন সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে কি না।

(৭) বাদী স্থায়ীভাবে ইনজাংসনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছে; তাহা সে পাইতে পারে কি না।

(৮) সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত মামলায় বাদীর কোন স্বত্ব প্রতিপন্ন হয় কি না।

(৯) মেজকুমারের শবদেহের সৎকার হইয়াছিল কি না।

(১০) বাদী কোনও সুবিধা পাইতে পারেন কিনা এবং তাঁহার কোনও সুবিধা পাইবার অধিকার থাকিলে তাহা কিরূপ ধরণের?

নিম্ন আদালতের রায়

১৯৩৬ সালের ২৪শে আগষ্ট তারিখে মিঃ বি সি চ্যাটার্জ্জির সওয়াল শেষ হয়

শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু (তিনি তখন ঢাকার অতিরিক্ত জেলা জজ. ছিলেন) এই মামলার রায় দেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, বাদীই ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ এবং তিনি ভাওয়ালের এক-চতুর্থাংশ সম্পত্তি পাইবার অধিকারী। জজ বাদীর অনুকূলে খরচাসহ ডিক্রী দেন। বিচারক রায়ে মন্তব্য করেন, "সর্ব্বশ্রেণীর সাধু প্রকৃতির পুরুষ নারী যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি। ইহাদের মধ্যে মদনকুমারের অধিকাংশ আত্মীয়ই যে কেবল আছেন, তাহা নহে, —বাঙ্গলার বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত এবং পদস্থ ব্যক্তিও আছেন। একজন প্রতারকের জন্য এই সমস্ত লোকের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অসম্ভব।" বড় সন্ন্যাসীর সঙ্গে কুমারের আকৃতি ও শারীরিক চিহ্নাদির সাদৃশ্য সম্বন্ধে বিচারক বলেন, "শারীরিক চিহ্ন এবং বিশিষ্ট লক্ষণ প্রভৃতির দ্বারা অকাট্য রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাদী ও মেজকুমার এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। —বাদী যদি পঙ্গু, অন্ধ এবং বধির হইয়াও প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন— তাহা হইলেও এই সিদ্ধান্ত (অর্থাৎ বাদীই যে মেজকুমার) অটুট থাকিত।"

দেড় হাজারের উপর সাক্ষীর সাক্ষ্য

এত দীর্ঘকালব্যাপী মামলার শুনানী জগতে আর কোন মামলায় হইয়াছে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীর কোন দেশে কোন মামলায় এত অধিক সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হয় নাই।

বাদীপক্ষে মোট ১০৬৯ (আদালতে ১০৪২ জন এবং কমিশনে ২৭ জন) এবং বিবাদীপক্ষে মোট ৪৭৯ জন (আদালতে ৪৩৫ এবং কমিশনে ৪৪ জন) সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হয়। সাক্ষীদের মধ্যে বাঙ্গলাদেশের বহু সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন।

হাইকোর্টে আপীল

বাইরা জজের রায়ের বিরুদ্ধে বিবাদীপক্ষ হইতে হাইকোর্টে আপীলের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৩৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী হাইকোর্ট আপীলের কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

১৯৩৮ সালের ১৪ই নবেম্বর কলিকাতা হাইকোর্টের স্পেশাল বেঞ্চে ভাওয়াল মামলার আপীলের শুনানী আরম্ভ হয়। ঐ দিন বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী মিঃ এ এন চৌধুরী সওয়াল আরম্ভ করেন।

১৯৩৯ সালের ২১শে মার্চ্চ হাইকোর্টে আপীলের শুনানীকালে বাদী আদালতে উপস্থিত হন।

১৯৩৯ সালের ১৭ই মে তারিখে হাইকোর্টে ভাওয়াল মামলার আপীলে বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী মিঃ এ এন চৌধুরীর সওয়াল শেষ হয়।

১৯৩৯ সালের ১৮ই মে তারিখে হাইকোর্টে ভাওয়াল মামলার আপীলের শুনানীকালে বাদীপক্ষের কৌঁসুলী মিঃ বি সি চ্যাটার্জ্জি সওয়াল জবাব আরম্ভ করেন।

১৯৩৯ সালের ২রা আগষ্ট তারিখে মিঃ বি সি চ্যাটার্জ্জির সওয়াল শেষ হয়।

বিচারপতি মিঃ বিশ্বাসের রায়

বিচারপতি মিঃ বিশ্বাস তাঁহার রায়ে বলেন :—

"বাদীর উক্তি এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ হইতে দেখা যায় যে, তাঁহার বক্তব্য এই যে, মধ্যমকুমার ইংরাজী এবং বাঙ্গলা নাম সহি করিতে শিখিয়া-ছিলেন। পরে তিনি লেখাপড়া ভুলিয়া যান কিন্তু কোন মতে নাম সহিটি মনে করিয়া রাখিয়াছেন। এই কথা পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী উভয় শ্রেণীর সাক্ষীদের সাক্ষ্য হইতেই স্পষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে বিবাদী পক্ষ প্রথমে মধ্যমকুমারকে সুশিক্ষিত এবং ইংরাজী জানা বলিয়া প্রকাশ করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত বলেন যে, তাঁহার সামান্য রকম বর্ণজ্ঞান মাত্র ছিল এবং তাহা ভাঙ্গা অশুদ্ধ ইংরাজীতে সাহেবদের সহিত কথা বলিতে পারিতেন। বিবাদী পক্ষের সাক্ষী এস ডি ঘোষালের সাক্ষ্য প্রথম উক্তির সমর্থক। পক্ষান্তরে আর সি সেন বলেন যে, তাঁহার সাক্ষাতে কুমার কোন সাহেবকে বলিয়াছিলেন, "Tea Garden gone"। আবার সত্যেন্দ্র বলিয়াছে যে সে মধ্যমকুমারের ইংরাজী লেখার সহিত পরিচিত ছিল।

মধ্যমকুমার যদি সত্য সত্যই লিখিতে পারিতেন, তাহা হইলে বিবাদী পক্ষ তাঁহার স্বহস্তে লিখিত কোন না কোন কাগজপত্র দাখিল করিতে পারিত। যে ৯খানি চিঠি মধ্যমকুমারের লিখিত বলিয়া দাখিল করা হইয়াছে, তাহার ৮খানি স্ত্রী বিভাবতীকে লিখিত এবং অপরখানি

প্রভাবতীকে লিখিত। বিশেষ বিবেচনার পর জজ এইগুলি জাল চিঠি বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হইয়াছে।

মামলার ঘটনা ও অবস্থা বিবেচনা করিলে এই ধারণাই দৃঢ়তর বলিয়া মনে হয় যে, বাদীর জেরা সম্পর্কে জজের সিদ্ধান্ত ঠিকই হইয়াছে এবং মি: চৌধুরীর সমালোচনা একেবারে নিষ্ফল। যে সকল বিষয়ে বাদীকে জেরা করা হইয়াছে, তাহার উত্তর তিনি মোটামুটি সঠিক ভাবেই দিয়াছেন।

বাদী একজন বাঙ্গালী জজের সম্মুখে ভাওয়ালী বাঙ্গলায় সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং বিবাদী পক্ষের কৌঁসুলীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁহার কোন ত্রুটিই উপেক্ষা করে নাই। বাদী যে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী নহেন, এ বিষয়ে আমি নিম্ন আদালতের জজের সহিত একমত। কাজেই বাদী যে ভাওয়ালের স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র রমেন্দ্রনারায়ণ রায়, এ সিদ্ধান্ত না করিয়া উপায় নাই।

মামলাটি তামাদি হয় নাই।

আমার মতে বাদীই যে ভাওয়ালের স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পুত্র রমেন্দ্রনারায়ণ রায়, এ সম্পর্কে নিম্ন আদালতের সুবিজ্ঞ বিচারকের সহিত একমত না হইয়া উপায় নাই।

যদিও তিনজন বিচারপতির নিকট মামলার শুনানী হয়, তথাপি বর্ত্তমানে দুইজনকেই রায় দিতে হইতেছে।

মামলার প্রধান দুইটি বিচার্য্য বিষয়—অর্থাৎ কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় জীবিত কি না এবং বর্ত্তমান বাদীই ভাওয়ালের কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় কি না—এই সম্পর্কে তাঁহার সহিত বিচারপতি লর্ড একমত হইতে পারেন নাই। এ অবস্থায় বিচারপতি কষ্টেলোর অভিমতই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সিদ্ধান্ত করিবার নিমিত্ত বিচারপতি কষ্টেলোর অভিমত আইনসম্মত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কি না, সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া আমি এই অভিমত প্রকাশ করিতেছি যে, ইংলণ্ড হইতে বেঞ্চের সিনিয়র বিচারপতি মি: কষ্টেলো যে অভিমত প্রেরণ করিয়াছেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত ঐ রায় বিবেচনা করা চলিতে পারে না,—অবশিষ্ট বিচারকগণের অভিমত অনুসারেই মামলার বিচার করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য দুইজন বিচারক ভিন্ন মত হইয়াছে।

বিচারপতি মিঃ লজের রায়

বিচারপতি মিঃ লজ তাঁহার রায়ে বলেন,—

"আমাদের নিকট আপীলের উদ্বোধন প্রসঙ্গে আপীলকারীর পক্ষের কৌঁসুলী মিঃ চৌধুরী বলিয়াছেন যে, নিম্ন আদালতে এই মামলার বিচারের সময় আদালত প্রাঙ্গণে প্রত্যহ বাদীর উৎসাহী সমর্থকগণের ভীড় হইত। সাক্ষ্য গ্রহণের সময় ইহারা প্রত্যেকটি সাক্ষ্য সম্পর্কে অনুকূল অথবা প্রতিকূল মতামত প্রকাশ করিত। বিবাদী পক্ষের কৌঁসুলী ও সাক্ষীদের বিরুদ্ধে প্রায়ই বিক্ষোভ প্রদর্শিত হইত। ঢাকা সহরে প্রত্যহ সংবাদপত্র মুদ্রিত হইত এবং এই সমস্ত সংবাদপত্রে বিবাদী পক্ষের সমর্থকগণের প্রতি বিরূপ করা হইত।

অপর পক্ষের কৌঁসুলী মিঃ চাটার্জ্জি এই বর্ণনার সত্যতা অস্বীকার করেন নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ আবহাওয়া শান্তভাবে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করার অনুকূল ছিল না। মামলার বিচারের সময় উত্তেজনাপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছিল। এই কারণে অথবা: কোন্ কথার প্রতিবাদ করা হইবে এবং কোন কথা স্বীকার করা হইবে—এই সম্পর্কে প্রথম দিকে দুই পক্ষই নিশ্চিত ছিল বলিয়া এক পক্ষ হইতে কোনও কথা বলা হইলে, তাহার কোনও গুরুত্ব থাকুক, আর নাই থাকুক অন্য পক্ষ হইতে সোজাসুজি তাহার প্রতিবাদ করা হইত। যে কথা স্বীকার করা হইয়াছে অথবা যে কথার প্রতিবাদ করা হইয়াছে তাহার সমর্থনে সাক্ষ্য দিবার সময় সাক্ষ্যের প্রাসঙ্গিকতা অথবা গুরুত্ব সম্পর্কে কোনরূপ বিবেচনা করা হইত না।

ইহার ফলে শত শত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া নথীপত্র ভারাক্রান্ত করিয়া তোলা হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃত ঘটনা জানিতে আমাদের কোনও সুবিধা হয় নাই।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বাদীকে চিনিতে অথবা চিনিতে না পারা সম্বন্ধে রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ যে সমস্ত সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহাতে কোনরূপ প্রতীতি না হয় তাহা হইলে এই সম্বন্ধে প্রজার (যাহাদের পক্ষে রমেন্দ্রকে দেখিবার খুব কম সুযোগ ছিল এবং তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলা-মেশা করিবার কোনও সুযোগই ছিল না) যে সাক্ষ্য দিয়াছে তাহা কোনরূপেই আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করিতে

পড়ে না। তথাপি বাদীর সহিত রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যে সাদৃশ্য অথবা বৈসাদৃশ্য আছে তৎসম্পর্কে শত শত প্রজার সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। এইভাবে অপ্রয়োজনীয় সাক্ষ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পক্ষে আমাদের কেবলমাত্র অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। এই মামলার পক্ষগণ আমাদের আরও একটি অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে। ঘটিত সাক্ষ্যপ্রমাণ হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর যে সমস্ত কর্ম্মচারী ভাওয়াল এষ্টেটের পরিচালনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারা, এষ্টেটের কর্ম্মচারী প্রজাবৃন্দ যাহাতে বাদীকে সমর্থন করিবে এবং তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে না পারে তজ্জন্য তাহাদের উপর চাপ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহারা পূর্ব্বে বাদীর পক্ষে যোগ দিয়াছিল তাহাদিগকে ভাগাইয়া আনিবার জন্যও চেষ্টা করা হইয়াছিল। এই প্রকার আচরণের তীব্রভাবে নিন্দা করা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত ঘটনার কথা বিবেচনা করিলে এষ্টেটের যে সমস্ত প্রজা ও কর্ম্মচারী বাদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছে তাহাদের সাক্ষ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে; এইভাবে সাক্ষ্য দিয়া তাহাদের সুবিধাই হইতেছে।

জনসাধারণকে বাদীর অনুকূলে সাক্ষ্য দান হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া বিবাদীপক্ষের এজেন্টরা যে একান্ত অসঙ্গত আচরণ করিয়াছে সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু এ ব্যাপারে কেবলমাত্র তাহারাই অপরাধী এইরূপ মনে করা হইলে ভুল হইবে। যে সমস্ত ব্যক্তি বিবাদীপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছে তাহাদিগকে আদালতের ভিতরে ও বাহিরে অপমানিত করা হইয়াছে।

এই ব্যাপারে ও অন্যান্য ব্যাপারে উভয় পক্ষই নানারূপ অসঙ্গত আচরণের অপরাধে অপরাধী। কোনও পক্ষই কলঙ্ক মুক্ত অবস্থায় আদালতে উপস্থিত হয় নাই।

কোনও পক্ষ অসঙ্গত আচরণ করিয়া থাকিলে তদ্দ্বারাই সেই পক্ষের বক্তব্য মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই। উভয় পক্ষের আচরণের ফলে আদালতের অসুবিধা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু কোন্ পক্ষের কথা যে সত্য তাহা ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় নাই।

এই মামলার একটি প্রধান ঘটনা এই যে, জ্যোতির্ম্ময়ী বাদীকে তাঁহার ভ্রাতা রমেন্দ্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। জ্যোতির্ম্ময়ী

দেবা যে সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহা সত্য কিনা এই প্রশ্নই বর্ত্তমান মামলার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

উভয় পক্ষ হইতেই অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে। যেখানে দুই পক্ষের এক পক্ষ হইতে এমন কোন কাহিনীর কথা বলা হয় যাহা মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতার বহির্ভূত এবং অপর পক্ষ হইতে বলা হয় যে, সমস্ত ঘটনাই সাধারণ এবং স্বাভাবিকভাবে ঘটিয়াছে, সেখানে যে কাহিনীটিকে অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে সেটিকে পরিত্যাগ করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু যেখানে একটি কাহিনীর অসম্ভাব্যতা অন্য কাহিনীর অসম্ভাব্যতার সমান অথবা তাহার চেয়েও বেশী সেখানে শুধু কোনও কাহিনীর অস্বাভাবিকতার কথা বিবেচনা করিয়াই সেই কাহনীকেই পরিত্যাগ করা যায় না।

উভয় পক্ষের সাক্ষ্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া সুবিজ্ঞ জজ উভয় পক্ষ সম্পর্কে একই মানদণ্ড ব্যবহার করেন নাই। বাদীপক্ষ ও বিবাদী পক্ষ হইতে যে সমস্ত সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে তৎপ্রতি সুবিজ্ঞ জজের আচরণের পার্থক্য সমগ্র রায়ে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে কোন্ সাক্ষী কি পরিমাণে নির্ভরযোগ্য—এই সম্পর্কে সুবিজ্ঞ জজ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার গুরুত্ব অনেক কমিয়া গিয়াছে।

নিম্ন আদালত যে ভাবে বিচার্য্য বিষয়ের সম্মুখীন হইয়াছেন, তাহা অসন্তোষজনক। বিভিন্ন সাক্ষীর সত্যবাদিতা সম্বন্ধে সুবিজ্ঞ জজ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাও তিনি মানিয়া লইতে পারেন না।

... ...

"আমার মতে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সাক্ষ্য পাঠ করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, তিনি একটিও স্পষ্ট কথা বা সত্য কথা বলেন নাই। গত ১৯১৭ সনে বর্দ্ধমানের মহারাজার লিখিত জবাব সম্পর্কে তাঁহার অজ্ঞতার ভাণ নিতান্ত অবিশ্বাস্য। জেরায় প্রত্যেকটি প্রশ্নে তিনি যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করিয়াছেন এবং যেখানেই সম্ভব হইয়াছে, সেখানেই তিনি সরাসরি জবাব এড়াইয়া চলিয়াছেন। বেনামী পত্রের, মাধব-বাড়ীর সন্ন্যাসীর ও নেপাল সন্ন্যাসীর আগমন এবং অক্ষয় রায় কর্ত্তৃক তদন্ত সম্পর্কে তিনি সাক্ষ্যে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি সত্য নহে বলিয়া মনে করি। ৪ঠা মের ব্যাপারে

পূর্ব বাদীর সহিত সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে তিনি যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা আমার নিকট সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হয়।"

"বাদী পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে ব্যক্ত করা যাইতে পারে:—(১) সাক্ষ্যে এরূপ নিঃসন্দেহেই সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের দার্জিলিঙে ৮ই মে মধ্য রাত্রিতে মৃত্যু হয়। (২) ১৯১৭ সালে প্রবল গুজব রটে যে, তিনি মেজকুমার, জীবিত আছেন এবং সন্ন্যাসীদের সহিত তিনি অবস্থান করিতেছেন। আরও নানা বাজে গুজব রটিতে পারে। এই সব গুজবে সপ্রমাণিত হয় না যে, তিনি জীবিতই আছেন। ১৯১৭ সালে এই গুজব রটিবার পর জয়দেবপুরে হয়তো মৌনী-সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইয়াছিল। সন্ন্যাসীর প্রদত্ত বিবৃতির কথায়ই এই গুজবের সৃষ্টি হয়, সেরূপ ধারণা করার কোনই কারণ দেখা যায় না। (৩) বেনামী-চিঠি দার্জিলিঙে কুমারের মৃত্যুর পরই পাওয়া যায় এবং মাধববাড়ীর সন্ন্যাসী আসিয়া রাজ পরিবারের লোকজনকে জানান যে, রমেন্দ্র জীবিত আছেন এবং অক্ষয় রায় বা সতীনাথ ব্যানার্জ্জি ঐ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়াছিলেন। এই সব কাহিনী খাঁটী কাল্পনিক। (৪) এই বাদীর যে স্মৃতিশক্তি লোপ পাইয়াছিল, সেরূপ ধারণা করিবার কোনই কারণ নাই। (৫) বাদী ঢাকায় এবং জয়দেবপুরে উপস্থিত হইলে প্রকৃতপক্ষে কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারে না। কেহ কেহ হয়তো মনে করে, মৃত রমেন্দ্রের চেহারার সহিত তাঁহার কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে এবং সেই সাদৃশ্যের হেতুজব করিয়া বেড়ায়। যে পর্য্যন্ত না জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী প্রকাশ করেন যে, বাদী তাঁহার ভ্রাতা সে পর্য্যন্ত কেহই তাঁহাকে চেনে না। (৬) জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীও বাদীকে চিনিতে পারেন না। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এবং তাঁহার আত্মীয়স্বজন সকলেই বাদী যে তাঁহার ভ্রাতা সকলকে বুঝাইতে এবং তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণাদি উপস্থিত করিতে, প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। (৭) বাদী, কি তাঁহার সমর্থক দল, কেহই রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যেরূপ আচরণ করা সম্ভবপর সেরূপ করেন না। বাদী প্রবঞ্চক মেজকুমার বলিয়া গৃহীত হইবেন না, তাঁহারা সকলেই এইরূপ আচরণই প্রদর্শন করেন। (৮) বাদীর শারীরিক গঠন, বয়স, উচ্চতা, শরীরের বাঁধন ও গায়ের রং রমেন্দ্রনারায়ণেরই ন্যায়। তা ছাড়া তাঁহার পায়ের গোড়ালির ও হাতের কব্জির ত্বকও থসথসে ও তাঁহার

বাম পায়ের গোড়ালিতে একটা আঘাতের দাগও আছে। এই দুইটি বৈশিষ্ট্যও রমেন্দ্রের ছিল। পক্ষান্তরে তাঁহার চোখের রং ভিন্ন রকমের, নাসিকার আকারও অন্য প্রকারের। বাদী যে কখনও উপদংশ রোগে ভোগে নাই ইহা মোটেই সম্ভব নহে। বাদীর উপদংশ রোগের ধরণ ও রমেন্দ্রের ঐ রোগের ধরণ যে একইরূপ হইতে পারিবে না, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। (৯) মানসিক অভিন্নতা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোনই প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে বাদীর নিজের জবানবন্দীই ঐরূপ অভিন্নতার সহিত খাপ খাওয়ান খুবই কঠিন ব্যাপার।

প্রতিবাদী পক্ষের লোকজনের ষড়যন্ত্র করার কোনরূপ মতলব ছিল না বা সুযোগও পায় না কিম্বা ষড়যন্ত্রকারীদের মত আচরণ তাহাদের দেখা যায় নাই। পক্ষান্তরে বাদীর প্রধান সমর্থকদের ষড়যন্ত্র করার মত মতলব ও সুযোগ দুই-ই উপস্থিত হয়। আর তাঁহাদের কার্য্যকলাপ ষড়যন্ত্রমূলক হইলেই তবে তাঁহাদের আচরণের সহিত উহার সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। আর তাঁহাদের কার্য্যকলাপ ষড়যন্ত্রমূলক না হইলেই বরং তাঁহাদের আচরণ অস্বাভাবিক ও সামঞ্জস্যবিহীন বলিয়া মনে হইবে। কাজেই বাদী যে একজন প্রবঞ্চক এবং তাহা জানিয়া-শুনিয়াই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ও আর আর সকলে যে তাঁহাকে সমর্থন করিতেছেন, সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই।

"বাদী যে একজন প্রতারক এ বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ বাদীকে একজন প্রতারক বলিয়া জানিয়াই সমর্থন করিয়াছেন! বাদী একজন পাঞ্জাবী এই অভিমত আমি সমর্থন করি, তবে তিনি যে ঔজলার মাল সিং বিবাদীপক্ষ যাহা বলিতেছেন সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নহি। আমার মতে বিবাদী পক্ষের আপীল নায় খরচা মঞ্জুর করা উচিত এবং নিম্ন আদালত বাদী পক্ষে যে রায় ও ডিক্রী দিয়াছেন, তাহা নায় খরচা ডিসমিস করাই উচিত।"

বিচারপতি মিঃ কষ্টেলোর রায়

"ভাওয়ালের মধ্যমকুমারের মৃত্যু হয় নাই, তাঁহাকে যখন দার্জিলিংয়ের শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল তখন তিনি সংজ্ঞাহীন ছিলেন, আপাত দৃষ্টিতে তাঁহাকে মৃত বলিয়াই মনে হইয়াছিল। এই ঘটনা ১৯০৯ সালে

৮ই মে সন্ধ্যা রাত্রিতে ঘটে এবং বাদী যেরূপ বলিয়াছিলেন, শব দাহ করিবার উদ্দেশ্যে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইলেও উহা দাহ করা হয় নাই। ৯ই তারিখ প্রাতঃকালে যে শব দাহ করা হয় তাহা কুমারের শব নহে। অপর কোনও ব্যক্তির শব। বাদী কুমারের উদ্ধার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা মূলতঃ সত্য। সাক্ষ্যপ্রমাণ বিবেচনা করিয়া এ বিষয়ে নিম্ন আদালত যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা এড়ানো সম্ভব নহে অধিকন্তু বাদীর চেহারায় এমন কিছু নাই যাহাতে মনে করা যায় যে, তিনি বাঙ্গালী নহেন এবং রমেন্দ্রনারায়ণ হইতে পারেন নাই। ভাওয়াল পরিবারের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বাদীর চেহারায় লক্ষিত হয়, ইহা অত্যুক্তি নহে।

বাদীর জবানবন্দী হইতে মনে হয় তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতে কোন কথা শিখাইয়া লওয়া হয় নাই।

আমার এবং ঢাকার নিম্ন আদালতের রায় পাল্‌টাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। বিচারপতি মিঃ বিশ্বাসের এই বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা সম্বন্ধে যখন একমত তখন বিভাবতী দেবী যে আপীল দায়ের করিয়াছেন, তাহা নায় খরচা ডিসমিস হওয়া উচিত।"

বাহির হইতেছে :—**বিধবা রাণীর শাঁখা ও শাড়ী**—মূল্য ১০ পয়সা।

প্রিন্টার—শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক "সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস"
২৩৩ নং নাণিকতলা মেন রোড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বাহির হইতেছে ! বাহির হইতেছে !!

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দাস

সম্পাদিত

ভাওয়াল মামলার আপীলের রায়

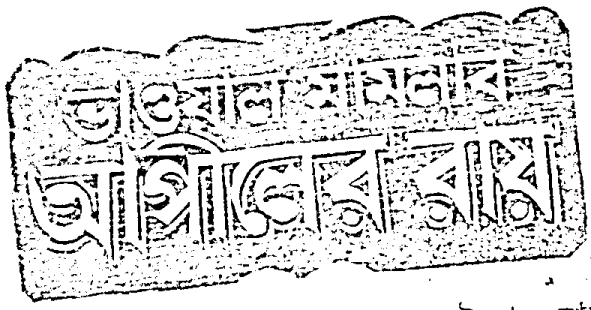

হাইকোর্টের তিনজন বিচারপতির সম্পূর্ণ রায়. ফাইন্যাল রায়সহ বড় বই।
মূল্য আট আনা !

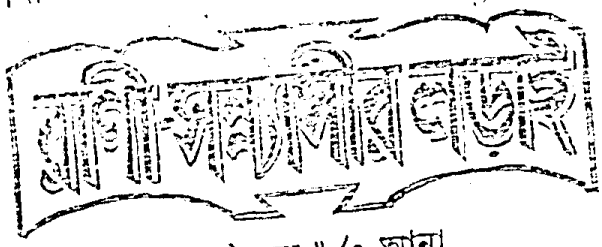

রাণী-সন্ন্যাসীর লড়াই

(যন্ত্রস্থ) মূল্য ।৵০ আনা

শেফালীর লাভার

১নং, ২নং ও ৩নং বাহির হইয়াছে।
প্রত্যেকখানির মূল্য /০ এক আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

সরস্বতী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৩৩ নং মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা।